বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ

দুটোর যৌক্তিক পার্থক্য কি এতো সহজ?

রির্চাড ডকিন্স

অনুবাদক: তানবীরা তালুকদার

এক ধরনের কাপুরষোচিত বোধশক্তিজনিত মানসিক শিথিলতা কিংবা আপোষকামিতার কথা বাদ দিলে বিচারশক্তিসম্পন্ন যুক্তিবাদী লোকদের সিদ্ধান্তগুলো বরং যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধেই যায় (এখানে সাম্প্রতিক যুগের Scientology$_{(1)}$ অথবা Moonies$_{(2)}$ -এগুলোর কথা বিচার্য্য নয়)। স্টিফেন জে গুল্ড তার প্রাকৃতিক ইতিহাস কলামে পোপের বিবর্তনবাদ এর প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রবলভাবে তার আপোষকামী মনোভাবকেই প্রকাশ করে -

“বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, সঠিক শিক্ষার অভাবে সেসব ক্ষেত্রে সহজেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার সমস্ত অন্তকরন দিয়ে, একটি সম্মানজনক, একটি ভালোবাসাময় চুক্তি (আমি এটাকেই গুরুত্ব দেই) ... ।"

যহোক, কি সেই দুটো সহজ দৃষ্টিতে পার্থক্যময় ক্ষেত্র, যাকে গুল্ড 'অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বলয়' (Nonoverlapping Magisteria, সংক্ষেপে NOMA) নামে অভিহিত করেছেন - আর ধারনা করেছেন এদুটোকে আমাদের সমান উষ্ণভাবে সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে বুকে ধারণ করে রাখতে হবে? গুল্ড আরো বলেছেন, 'বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু ভৌত বাস্তবতার আলোকে প্রায়োগিক বিশ্বকে ধারণ করে। আর ধর্মের জ্ঞান মানুষের নৈতিক চিন্তা আর মূল্যবোধের ধারনাকে প্রসারিত করে।' কিন্তু সত্যই কি তাই?

নৈতিকতা কারা ধারণ করে ?

আসলে ব্যপারটা কি এতোই সরল? কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি সে আলোচনায় যাবো যেখানে আসলে পোপ বিবর্তনবাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন তার ভিত্তি তুলে ধরব এবং এরপর তার চার্চের অন্যসব স্বীকৃতির ব্যাপারেও কিছু কথা বলব। দেখবো আসলেই এগুলো এতো পরিস্কারভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাখা দেয় কি না। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আকারে ধর্মের সেই দাবী নিয়ে আলোচনা কারা যাক- যেখানে বলা হয় ধর্ম বিশেষ দক্ষ ভাবে আমাদের নৈতিকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। এ ধারনাটি অনেক সময় অনেক অবিশ্বাসী লোকও সাদরে গ্রহন করেন, ধারনা করা হয় সভ্যতার সাথে সাথে "মাথা নুয়ে" তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বোচ্চ যুক্তিকে স্বীকার করে নেয়া - সে যতো দুর্বল যুক্তিই হোক না কেন।

প্রশ্ন হলো, “কোনটি ভুল এবং কোনটি ঠিক?” এটি একটি সত্যিকারের কঠিন প্রশ্ন যেটার উত্তর বিজ্ঞান হয়ত দিতে পারে না। নৈতিকতার অবয়ব দিয়ে কিংবা পূর্ববর্তী নৈতিক বিশ্বাস দিয়ে, গুরুত্বপূর্ন এবং কঠিন সব লৌকিক নৈতিক দর্শনের নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে একজনকে হয়তো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক কারনের সাহায্যে এর সাথে জড়ানো সংশ্লিষ্ট গোপন বিশ্বাসকে, অলক্ষ্যনীয় সামঞ্জস্যহীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি মানুষের অন্য কোন জায়গা থেকে আসা উচিৎ, অনুমান করা যায় যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বের কোন দৃঢ় প্রত্যয় থেকে। বিশ্বাসীদের দাবী অনুযায়ী এটা হয়ত আসে ধর্মের মাধ্যমে- মানে ঈশ্বর, ধর্মগুরু, সনাতন ঐতিহ্য, এবং একটি ঐশী বইয়ের মাধ্যমে এই নৈতিকতার টনিক বিতরন করা হয় - মানবজতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে, যে আশাটা ধর্ম দিতে পারে সেটা উষর প্রস্তরখন্ড ছাড়া কিছু নয়, সেখানে থেকে উৎপন্ন হওয়া বালির ভিত্তি সম নৈতিকতাগুলো একেবারেই নিস্ফলা। সত্যি বলতে কি- প্রাত্যহিক জীবনে কোন সভ্য মানুষই ধর্মগ্রন্থকে নৈতিকতার চূড়ান্ত বাহন হিসেবে পালন করে না। বরং আমরা নিজেদের পছন্দনীয় শ্লোক বা আয়াত ধর্মগ্রন্থ থেকে বেছে নেই (যেমন, 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই', 'প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার কর' -এধরনের হিতোপদেশ সমূহ), এবং সানন্দে অশোভন অংশটুকু বাদ দিয়ে দেই (যেমন বেগানা নারীকে বেত্রাঘাত, বা তাদের ব্যাভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা, স্বধর্মত্যাগীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যার আইন চালু করা, প্রতিপক্ষের বংশধরদেরকে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি)। পুরনো বাইবেলের যে সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজেই এক নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, নারী পুরুষের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং ভয়ংকর রক্তপিপাসু এক চরিত্র, আজকের সমাজে কোন ব্যাক্তি তাকে আর্দশ চরিত্র বলে মেনে নেবে না। হ্যা, অবশ্যই আমাদের আজকের সভ্যতার অর্জনের আলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিনীতিকে বিচার করা খুবই অনুচিত । আর সেটাই আমার “আসল” কথা! স্পষ্টতই, আমাদের কাছে নৈতিকতার কিছু চূড়ান্ত বিকল্প উৎস আছে, যা আমাদের সুবিধামতো ধর্মগ্রন্থকে পদদলিত করে হলেও সামনে এগিয়ে যায়।

সেই বিকল্প উৎসটিকে মনে হয় খুবই উদার মতের শালীন ধারার এবং প্রাকৃতিক ন্যায় বিচারক যা ইতিহাসের সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়, যখন যেই ধর্ম প্রচারক থাকে তার প্রভাবনুসারে নিয়মিত পরিবর্তন হতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, তা খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে, এমনকি আমাদের মধ্যে যারা খুব ধার্মিক তারাও এটাকে ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশী ধর্মগ্রন্থকে অবহেলা করে থাকি, সে সমস্ত বানীগুলোকেই উদ্বৃত করা হয় যেগুলো আমাদের উদার মানসিকতাকে ধারন করে আর যেগুলো করে না সেগুলোকে সযত্নে সজ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর যেখান থেকেই সেই উদারতা আসুক না কেনো, এটা আমাদের সবার জন্যই গ্রহনযোগ্য সে আমরা ধার্মিক হই কিংবা না হই।

অনুরূপভাবে, যীশু খ্রীষ্ট কিংবা গৌতম বুদ্ধের মতো মহান সব ধর্ম শিক্ষকরা, তাদের নিজেদের চারিত্রিক ভালো গুন দ্বারা আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেন, তাদের ব্যাক্তিগত চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিকতাকে গ্রহন করার জন্য। কিন্তু আমরা আবার সেই ভালো কয়েকজন ধার্মিক নেতার মধ্যে থেকেই বাছাই এবং পছন্দের কাজটা করছি, জিম জোন্স অথবা চার্লস ম্যানসন এর মতো পাজী ধার্মিক নেতাদের বাদ দিয়ে। কিন্তু আমরা আর্দশ হিসেবে জওহারলাল নেহরু কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নীতিবান নেতাদেরও তো গ্রহন করতে পারি। প্রথাগতভাবে, যেহেতু যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে তাই ভালো কি মন্দ সে বিচার না করে, আমরা আমাদের নৈতিকতা আর

শালীনতার বিচার এবং প্রকৃতি থেকে আহরিত জ্ঞান দিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেই কোনটা গ্রহন করব আর কোনটা বর্জন করব।

(চলবে)

তথ্যসূত্র (অনুবাদকের সংযোজন)

1. এল. রন। হার্ভাড Sceintelogy এর প্রবক্তা। ১৯৫০ সাল থেকেই তিনি এ নিয়ে কাজ শুরু করেন যা তিনি ১৯৫২ সালে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে তার এ মতবাদকে তিনি ধর্মের নাম এবং রূপ দেন। ১৯৬০ সালে তিনি Sceintelogy কে এই বলে সংঙ্গায়িত করেন, এ ধর্মনীতির মূল হলো, বিশ্বাস, আচরন আর ঐতিহাসিক পটভূমি আর ধর্মনীতি শব্দটি নিজেই নিজেকে প্রতিফলিত করে। Sceintelogy চার্চ এর অনুসারীরা এ ধর্ম সর্ম্পকে বলেন, “সত্যের শিক্ষা হলো এ ধর্মের মূল কথা” । মূল শব্দটি নিজেই ল্যাটিন শব্দ ***scientia*** এর জোড়া যার মানে হলো “জ্ঞান, দক্ষতা” অর্থ্যাৎ এর মূল ক্রিয়াপদ হলো জানা।

2. সান মুংগ মুন Moonies ধর্মের প্রবক্তা। ইউনিফিকেশন কমিউনিটি চার্চ থেকে ১৯৭০ সালে এ ধর্মের যাত্রা শুরু। এ ধর্মালম্বীরা নিজেদেরকে চাদের সন্তান মনে করেন। ১৯৭৪ সালে মেডিসন স্কয়ার গার্ডেন চার্চের এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ ধর্মালম্বীদের সাধনার তিনটি স্তর থাকে, Moonies থেকে সাধনার মাধ্যমে **SUNNIES।** এবং **SUNNIES** এর সাধনা থেকে পাওয়া শক্তি ও ভক্তি তাকে KINGIES এর বা সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবে, যা সাধনাকে পরিপূর্ন করবে।

তানবীরা তালুকদার

১৭.০৪.০৮